OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 107 - 114
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 107 - 114
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নাসরীন জাহানের ‘স্থবির যৌবন’ : নারী জীবনের বহুমাত্রিক সংকটের বহিঃপ্রকাশ

ড. প্রতাপ ব্যাপারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ শালবনি
Email ID : pratapbapari@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Nasreen Jahan, Bengali fiction, Storytelling, Patriarchy, Symbolism, Self-empowerment, Gender relationships, Societal conflicts, Psychological experiences.

Abstract

Nasreen Jahan is a unique voice in Bengali fiction, known for her deeply artistic and unconventional storytelling. Her narratives break away from traditional structures, weaving a rich tapestry of human emotions, societal conflicts, and psychological complexities. Without resorting to exaggerated emotions, her works offer a refined and artistic portrayal of reality, where every character and setting reflects life's intricate truths. Her storytelling follows two distinct yet interconnected threads. On one hand, she explores the suffocating patriarchy of urban life, highlighting strained relationships, conflicts, and the anxieties of mistrust. On the other hand, she captures the aesthetic essence of rural life, where women are not merely oppressed figures but individuals engaged in an ongoing quest for self-empowerment. She does not depict a singular, rigid reality; instead, her stories unfold through layers of symbolism, contrasts of light and shadow, and an intricate analysis of human relationships.

A defining feature of Nasreen Jahan’s storytelling is her ability to create depth without relying on sensationalism. The surprises in her narratives arise naturally from her keen insights rather than from deliberate dramatic twists. Unlike many conventional female writers, she does not portray men solely as oppressors or women as helpless victims. Instead, she presents a complex reality where both men and women exist in conflict, engage with societal forces, and ultimately seek meaning through their struggles. Her literature is not detached from reality but a refined representation of lived experiences. She masterfully unveils the hidden tensions within gender relationships, compelling readers to reflect on social structures and personal identities. In a society where women’s contributions and struggles often remain invisible, her stories serve as a powerful medium for recognition and change. Nasreen Jahan’s fiction is more than just storytelling— it is a profound meditation on life, relationships, and the search for identity, making her an essential voice in contemporary Bengali literature.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 107 - 114
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

নাসরীন জাহান বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ভুবনে এক স্বতন্ত্র স্বর, এক নিবিড় শিল্পীসত্তা। তাঁর লেখনী যেন বর্ণনার এক অভিনব প্রবাহ, যেখানে প্রচলিত ঘরানা থেকে সরে এসে তিনি আপন কণ্ঠস্বরের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। তাঁর গল্পসমূহ কেবল আখ্যান নয়, বরং বাস্তবতার এক গভীর অনুধ্যান। সমাজের সংকট, মানুষের মনোজগতে লুকিয়ে থাকা দ্বন্দ্ব, সংশয় ও বিকার— সবকিছুই তাঁর সৃষ্টির মেদুর মাটিতে গেঁথে আছে। তাঁর রচনায় আবেগের অতিশয়োক্তি নেই, বরং আছে সূক্ষ্ম ও শিল্পিত নির্মাণ, যেখানে প্রতিটি চরিত্র ও পরিবেশ যেন জীবনেরই অনিবার্য প্রতিফলন।

নাসরীন জাহানের গল্পের বুননে দুটি প্রধান ধারা প্রবাহিত হতে দেখা যায়। একদিকে নাগরিক জীবনের পুরুষতান্ত্রিক বলয়ের নিঃশ্বাসরোধী আবহ, সম্পর্কের ক্লান্তি, দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাসের অস্থিরতা, অন্যদিকে গ্রামীণ জীবনের এক অনন্য নন্দনচেতনা, যেখানে নারী কেন্দ্রীয় চরিত্র, কিন্তু সেই নারী নিছক অবদমিত বা শোষিত নয়— বরং সময়ের স্রোতে নিজস্ব শক্তির অন্বেষায় নিরন্তর তৎপর। গ্রাম ও শহর, দুই প্রেক্ষাপটেই তিনি কোনো একরৈখিক বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চান না; তাঁর গল্পের পরতে পরতে থাকে প্রতীক, আলো-আঁধারের মিতালি, এবং মানুষ ও সমাজের সম্পর্কের এক অন্তর্গত ব্যাখ্যা। একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, নাসরীন জাহান চমকের মোহে আখ্যানকে পরিণত করেন না; বরং চমক তাঁর গল্পে আসে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টির স্বাভাবিক ফলস্বরূপ। সেই চমক নিছক নাটকীয়তা নয়, বরং আখ্যানের অন্তর্নিহিত দর্শনের অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ। এখানেই তিনি প্রচলিত নারী সাহিত্যিকদের চিরাচরিত একপেশে পুরুষবিরোধী অবস্থান থেকে পৃথক। তিনি পুরুষকে এককভাবে শোষকের প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখান না, আবার নারীকে নিছক দুর্দশাগ্রস্ত চরিত্র হিসেবেও উপস্থাপন করেন না। বরং তাঁর গল্পের নারী ও পুরুষ বাস্তবতার বহুস্তরীয় পরিপ্রেক্ষিতে একসঙ্গে বাঁচে, দ্বন্দ্বে জড়ায়, আবার সেই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই সমাজ-সংস্কৃতি ও অস্তিত্বের মূল সত্যকে উপলব্ধি করে।

তাঁর রচনা কোনো কাল্পনিক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়; বরং বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা অভিজ্ঞতার এক শিল্পিত রূপায়ণ। সমাজ-বাস্তবতায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা, টানাপোড়েন এবং তার গভীর অন্তর্নিহিত অসংগতি তিনি পাঠকের সামনে মেলে ধরেন এক অনন্য দক্ষতায়। তাঁর গল্পের চরিত্ররা নিছক কাহিনির অংশ নয়; তারা জীবনেরই প্রতিনিধি। ফলে, তাঁর সাহিত্য নিছক গল্প বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা পাঠকের অনুভূতি ও বোধের জগতে প্রবল আলোড়ন তোলে। আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান এক অদৃশ্য উপস্থিতি— তার শ্রম, তার আত্মসংগ্রাম, তার অনুভূতি যেন পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে। অথচ নারী-পুরুষ একে অপরের সম্পূরক, একে অপরের অপরিহার্য সঙ্গী। এই সত্যের স্বীকৃতি ছাড়া সমাজের সামগ্রিক চিত্র অসম্পূর্ণ। নাসরীন জাহান সেই অসম্পূর্ণতাকে গল্পের ভাষায়, শৈলীর সৌন্দর্যে, গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই তাঁর গল্প শুধু গল্প নয়— তা হয়ে ওঠে এক অনিবার্য জীবনদর্শন।

নারী ও পুরুষ— উভয়েই মানবপ্রজাতির অংশ, অথচ সমাজের বাস্তব চিত্র একেবারেই অন্যরকম। পুরুষ সেখানে শাসকের ভূমিকায়, আর নারী যেন চিরকাল অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা। এই বৈষম্য শুধু অন্যায়ই নয়, এটি মানুষের মৌলিক মর্যাদার বিরুদ্ধে এক সুস্পষ্ট আঘাত। কোনো সমাজে যদি একজন মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবে তা নিপীড়নের চূড়ান্ত রূপ। নাসরীন জাহানের ছোটগল্পের পরতে পরতে এই বাস্তবতার এক সুচিন্তিত বিশ্লেষণ ধরা পড়ে। তিনি কেবল নারীজীবনের নিছক বর্ণনা দেন না, বরং সেই বর্ণনার মাধ্যমে সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা নির্মম সত্যকে উন্মোচিত করেন। তাঁর রচিত নারীচরিত্ররা কল্পনার ফসল নয়, তারা আমাদের চারপাশের বাস্তব জীবনেরই প্রতিচিত্র। আমাদের চেনাজানা পরিধির বহু নারী যেন তাঁর গল্পের আঙ্গিকে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে, যেন তারা জীবনের কঠিন বাস্তবতার এক নীরব স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছে। তাঁর গল্পে নারীজীবনের বহুমাত্রিক সংকট অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী শিল্পভাষ্যে রূপ পেয়েছে। সেখানে নারীর অবদমিত স্বর, তার লড়াই, তার স্বপ্ন ও ব্যর্থতা— সবকিছু এক সংবেদনশীল বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এই গল্পগুলো নিছক কাহিনি নয়; বরং সমাজের এক নির্মম আয়না, যেখানে প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি দ্বন্দ্ব ও প্রতিটি যন্ত্রণার রেখা আমাদের বাস্তবতার সাথেই মিশে থাকে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 107 - 114
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাসরীন জাহানের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'স্থবির যৌবন'-এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গল্প 'পরগাছা', যেখানে কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে নাদের আলী নামের এক নিঃস্ব, আশ্রয়হীন মানুষ। তাঁর মেয়ের করুণ পরিণতির পর সে ঠাঁই নিয়েছে মৃত মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে, কিন্তু সেই আশ্রয় যেন দাসত্বের শেকলে বাঁধা। গৃহকর্তা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে সে কেবলই এক বোঝা, এক বোবা পশু, যাকে শুধু হুকুম তামিল করার জন্যই রাখা হয়েছে। তবু সে সেখানেই পড়ে থাকে, অপমান গিলে, শাসন সহ্য করে, কারণ তার আর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তবে এই পরিবারে একমাত্র ব্যতিক্রম গৃহকর্তার মেয়ে নীলা। যদিও সে নাদের আলীর প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতিশীল, তবু তার দৃষ্টিতেও নাদের আলী একজন 'পরগাছা', এক পরজীবী, যে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল। নীলা যখন নাদের আলীর প্রতি মমতা দেখায়, তখন সে নিজের মৃত মেয়ের ছায়া খুঁজে পায় তার মধ্যে, এবং সেই স্মৃতির ভারে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করে। গল্পের গভীরতম বাঁকে ফুটে ওঠে সমাজের অন্ধকারতম চিত্র। নাদের আলীর কন্যার করুণ পরিণতি—

> "এদের বাড়িতেই কাজ করত তার মেয়ে। তারপর গৃহকর্তা একটু অসতর্ক হওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বস্তির গুণ্ডারা হুমকি দিয়ে মেয়েটাকে বিয়ে করাতে বাধ্য করে গৃহকর্তাকে। অনেক রকম লাঞ্ছনা সহ্য করেও এই বাড়িতে সেই যে পা রেখেছিল সে, এরপর হাজার ধাক্কায়ও এ বাড়ির মানুষগুলো সেই পা সরাতে পারেনি। প্রথম দিকে এ নিয়ে কম ধাক্কা সামলাতে হয়নি। সেই ধাক্কা খেতে খেতেই এক সময় নাদের আলীর সব ইন্দ্রিয় ভোঁতা হয়ে গেছে।"[১]

এক নিঃস্ব নারী, যাকে গৃহকর্তার লোলুপ দৃষ্টির শিকার হতে হয়, যে নিরুপায় হয়ে এই ঘরেই বধূ হয়ে আসে, কিন্তু শেষতক বাঁচতে পারে না। তার আত্মহত্যা যেন নারীর প্রতি সমাজের নির্মম নিষ্পেষণের এক প্রতীক। পুরুষতন্ত্রের রক্তচক্ষুর সামনে নারী এখানে শুধু একটি শরীর, ভোগ্যবস্তু— তার ব্যক্তি স্বত্তা, তার অনুভূতি, তার স্বপ্নের কোনো মূল্য নেই। এই সমাজ ধর্ষিতাকে কলঙ্কিত করে, কিন্তু ধর্ষক থেকে যায় নির্বিঘ্নে। কিন্তু গল্পটি এখানেই থেমে থাকে না। গল্পকার নাদের আলীর মধ্যে দিয়ে পুরুষতন্ত্রের আরেকটি দিক তুলে ধরেন। যে পুরুষ নিজে অবহেলিত, যাকে সমাজ পরগাছা বলে, সেও কি এই ব্যবস্থার শিকড় ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে? নাদের আলীর অবচেতনেও কাজ করে পিতৃতন্ত্রের সেই গোপন ছায়া। যখন সে জ্বরের ঘোরে মৃত কন্যার মুখে স্ত্রীর প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায়, যখন সে নীলাকে কাছে টানতে চায়, তখন স্পষ্ট হয় যে এই সমাজব্যবস্থা শুধু নির্যাতিত সৃষ্টি করে না, একই সঙ্গে তা নির্যাতকের জন্মও দেয়। সেই মুহূর্তে নীলা তাকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে— যে নীলা এতদিন নাদের আলীকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, সেই নীলাই আজ তাকে তাড়িয়ে দেয়।

গল্পের শেষ দৃশ্যটি এক অবিস্মরণীয় যন্ত্রণার মুহূর্ত। নাদের আলী যখন জানতে পারে 'প্যারাসাইট' শব্দের প্রকৃত অর্থ, তখন তার আত্মা হাহাকার করে ওঠে। এতদিন যাকে সে আশ্রয় ভেবেছিল, যে সম্পর্কগুলোকে সে নিরাপদ ভেবেছিল, তা আসলে শুধুই এক পক্ষপাতমূলক সমাজের নির্মম খেলা। গল্পের অন্তিম মুহূর্তে নাদের আলী আর ফিরে যেতে পারে না, সে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যায়— যেন প্রতিটি নিঃস্ব মানুষের চিরন্তন পরিণতি। 'পরগাছা' কেবল একটি গল্প নয়, এটি আমাদের সমাজের একটি নির্মম প্রতিবিম্ব। এখানে নারী কেবল নিপীড়িত নয়, বরং তার প্রতি অবিচারের শেকড় এত গভীরে যে তা একদিন নিপীড়কের মনস্তত্ত্বেও স্থান করে নেয়। নাসরীন জাহান এই গল্পে কেবল নারী নির্যাতনের চিত্র আঁকেননি, বরং দেখিয়েছেন কীভাবে একটি গোটা সমাজব্যবস্থা এর জন্য দায়ী।

নারী জীবনের এক অনন্য অনুষঙ্গ— মাতৃত্ব। এই মাতৃত্ব কখনো স্নেহময়ী আশ্রয়, কখনো বা এক অন্তহীন সংকটের নাম। সমাজের কঠোর বাস্তবতায় এই মাতৃত্বের মর্যাদা ও সংকটের দ্বৈততা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাসরীন জাহানের 'জনক' গল্পটিও যেন সেই জীবনদর্শনের এক চিত্রপট। গল্পের কথক এক সন্তানসম্ভবা নারী, হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে শুয়ে চিন্তার অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। সে ভাবছে— গর্ভে যে প্রাণ অঙ্কুরিত হয়েছে, তার প্রকৃত জনক কে? স্বামী রায়হান, নাকি এক সময়ের ভালোবাসার পুরুষ জিতু? এই এক প্রশ্ন তাকে ছিন্নভিন্ন করে, টেনে নিয়ে যায় এক গভীর আত্মসংকটের জগতে। তার মনে হতে থাকে— একটি শব্দ, একটি অনুভূতি কতখানি নিঃসংশয়, কতখানি কঠোর! গল্পকারের ভাষায়, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 107 - 114
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সন্তান! কী আজব শব্দ! কী মৃত্যুর মতো নিষ্ঠুর শব্দ! সায়েন্স আর কী বলে! নিয়ম মতো লাল স্রোতের আগমনের পর এগারো, বারোদিনের ডগায় জিতু নামের এক মহাশক্তির দিকে আমি তর্জনীর ডগায় করে আমার দেহটি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। বিজ্ঞানের হিসেবে সন্তান আসার সেটাই একজন নারীর বিপদজনক সময়।"[২]

বিজ্ঞানের নিরিখে সে হিসাব মেলায়— সে সময়, সে মুহূর্ত, যখন জিতুকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিল। তাহলে কি তার গর্ভে বেড়ে ওঠা এই প্রাণের উৎস জিতু? প্রশ্নের ভার যেন তার মনকে গ্রাস করে। মাতৃত্ব, যে নারীর শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি, তার মধ্যেই কি লুকিয়ে আছে নিঃসীম শঙ্কার আধার? সমাজ তো নারীকে শুধু 'মা' বলেই জানে না, আরও কিছু পরিচয় তার গায়ে সেঁটে দেয়— সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলে। নারীর ভালোবাসা পুরুষতন্ত্রের চোখে যেন আত্মবিসর্জনেরই আরেক রূপ। তার ইচ্ছা, তার আকাঙ্ক্ষা, তার ব্যক্তিসত্তা— সবই যেন অগ্রাহ্য। ভালোবাসা মানে কি কেবল পুরুষের আনন্দ, নারীর আত্মনিবেদন? এ যেন এক পক্ষপাতদুষ্ট সমাজের লিখে দেওয়া শর্ত, যেখানে নারীর দ্বিধা, সংকট, অভিমান সবই পরিণামে তার এক অনিবার্য আত্মত্যাগের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। এই সংকটে পড়ে কথকের হৃদয়ে জন্ম নেয় এক অস্থির প্রশ্নমালা—

> "আমার পুরোটা জীবন কি এইভাবে যাবে? সন্তানের ভেতর জিতুকে আবিষ্কার করে, ওকে কেন্দ্র করে ডালপালা মেলতে থাকা রায়হানের স্বপ্নে... দ্বন্দ্বে, কষ্টে... এই রকম অর্থহীন অস্থির জীবন যাবে? আমি কি কোনোদিন সুস্থ গাছ হতে পারব না? আমার চুড়ো কি স্পর্শ করবে না আকাশ? এই রকম রক্তপাত, এইরকম সিদ্ধান্তহীনতা, বিবেকের পচা কামড়... এক জীবন? আর আমার সেই ক্ষয়িষ্ণুতার ওপর পা ফেলে লাফাবে উদ্ভাসিত সন্তান, তার ডাল হবে, পাতা হবে, আকাশ ছোঁবে সে।"[৩]

অথচ নারীকে চিরকাল এইভাবেই যেন টিকিয়ে রাখা হয়েছে— এক দ্বিধার অতলে, এক অস্পষ্টতার গহ্বরে। পিতৃতন্ত্র চায়, নারী যেন প্রশ্ন না তোলে, যেন চোখ বুজে সমস্ত সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। কিন্তু যদি একদিন সে নিজের পরিচয় নিজের হাতেই তুলে নেয়? যদি সে বুঝতে পারে যে, মাতৃত্বের আসল পরিচয় কেবল সমাজের দেওয়া নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়? এমনই এক উপলব্ধির মুহূর্ত আসে কথকের জীবনে। শয্যায় শুয়ে, শিশুটির অস্তিত্ব অনুভব করে হঠাৎই তিনি যেন নিজেকে চিনতে পারেন নতুন করে। রায়হান নয়, জিতু নয়— এই সন্তানের একমাত্র জনক সে-ই! সে-ই তার সৃষ্টির আধার, তার পরিচয়ের মূল। গল্পকারের ভাষায়—

> "হঠাৎ কী এক আবিষ্কারে আমি উদ্ভাসিত হয়ে জেগে উঠতে থাকি। এত অপাঙক্তেয়, এত ক্ষুদ্র করছি নিজেকে নিজে! নিশ্চয়ই পরিচয় তার কাছে। কুয়াশার জট থেকে বেরোতে বেরোতে রোদের আলোয় শিশুটিকে উল্টেপাল্টে দেখি। বিচিত্র আনন্দের মধ্যে জিতু নয়, রায়হান নয়, শিশুটির একমাত্র জনক হিসেবে এক সময় আমি নিজেকে চিহ্নিত করি।"[৪]

এ গল্প শুধু এক নারীর নয়, এ গল্প সমাজের সমস্ত নারীর, যারা যুগে যুগে নিজের পরিচয়ের জন্য, নিজের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে। একদিন হয়তো সমস্ত নারীরাই এই সত্য উপলব্ধি করবে— তাদের পরিচয় কারও দয়া বা স্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়, তাদের অস্তিত্বই তাদের প্রকৃত পরিচয়।

এক ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে 'বিকার' গল্পে। মতি— এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু সে কি আদৌ কোনো কেন্দ্র ধরে রাখতে পেরেছে তার জীবনে? সমাজের কঠোর বাস্তবতা, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, এবং বেঁচে থাকার তীব্র সংগ্রামের মধ্যে সে ক্রমাগত এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আছে। জীবনের দুঃস্বপ্নগুলো তার রক্তে, তার স্নায়ুতে এমনভাবে মিশে গেছে যে মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে সে কাঁপতে থাকে। এটিই তার বিকার। এই বিকারের বীজ সে বহন করে এসেছে তার পরিবেশ থেকে— সে সমাজ যেখানে দুর্বলতা মানেই পরাজয়, যেখানে বঞ্চিত মানুষেরা স্বপ্ন দেখলেও তা একদিন কর্পূরের মতো উবে যায়। এক নির্মম খুন, স্ত্রীর জন্য কিছু করতে না পারার গ্লানি, কিংবা তার সাইকেলের নিচে চাপা পড়ে যাওয়া এক বৃদ্ধার মৃত্যু— এসব দৃশ্য ক্রমশ জমাট বাঁধে মতির অবচেতনে। কিন্তু সে জানে না এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির পথ কী। কোথাও যাওয়ার রাস্তা নেই, কিছু বদলে ফেলার উপায় নেই। তারপরও মানুষ স্বপ্ন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 107 - 114
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেখে, স্বপ্ন দেখতে বাধ্য হয়। মতি স্বপ্ন দেখেছিল তার ছোট ভাইটিকে নিয়ে— যে শহরে পড়ে স্মার্ট হবে, বড় মানুষের মতো ইংরেজি বলবে, চেয়ারম্যানের ছেলের সামনে গড়গড় করে কথা বলবে। আর সেদিন গর্বে ফুলে উঠবে তার বুক। কিন্তু জীবন কি কাউকে সহজে স্বপ্নের নাগাল পেতে দেয়? গল্পকারের ভাষায় মতির হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে —

> "কিন্তু ছেলেটা শহুরে হতে পারল না কোনোকালে। যতবারই সে গাঁয়ে এসেছে, মতি তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের প্রতিফলন দেখতে চেয়েছে তার ভেতর। বারবারই ছেলেটি মতিকে নিভিয়ে দিয়ে সেই পুরনো কায়দায় কাপড় পড়ে মতির সামনে কাঁচুমাচু হয়ে বলেছে ভালো আছেন ভাইজান? কলেজে পড়েও সে চেয়ারম্যানের মেট্রিক ফেল ছেলেটার সামনে গিয়ে মতির মতোই কুঁকড়ে থাকে। আরে। এই যদি তোর উন্নতি হইবো তো শহরে গিয়া কি বাল ফালাইবার লাইগা ভর্তি হইছস? মতির মতো দফতরি নয় চাষাগিরি করলেই তো হইতো।"[৫]

মতির জীবনে কোনো বিপ্লব নেই, কোনো পরিবর্তন নেই। আছে শুধু ভয়। মৃত্যু ভয়। ক্ষুদ্র এক জীবনের আরও ক্ষুদ্রতর সংকট, এবং সেই সংকট থেকে বেরোতে না পারার যন্ত্রণা। অথচ এই ভয়ই যেন তার একমাত্র সহচর। কিন্তু এই গল্প শুধু মতির একার নয়। এ গল্প আরও কারও, আরও কারও বঞ্চনার, বিশেষত নারী জীবনের। তাহেরা— মতির স্ত্রী, সে এই ভয়-সংকট-দারিদ্র্যের বাস্তবতায় আরও অসহায়, আরও উপায়হীন। মতি হয়তো সমাজের চোখে এক অকর্মা, ভীরু পুরুষ। কিন্তু নিজের ঘরের ভেতরেই তার পুরুষত্ব যেন তীব্র হয়ে ওঠে। তাহেরা তার পৌরুষত্ব নিয়ে কটাক্ষ করলে আহত হয়ে মতি গর্জে ওঠে—

> "চুপ কর হারামজাদি। হঠাৎ মিশ্র অনুভূতির ধাক্কায় ক্ষেপে ওঠে মতি। বেশি লাই পায়া গেছস। এই মরদের পা চাইট্যাইতো খাইতাছস।"[৬]

পুরুষতন্ত্র শাসিত সমাজে একজন হতাশ, দুর্বল পুরুষও নিজের হতাশার ভার নারীর ওপর চাপিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। বাইরে যেখানে সে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে, ভিতরে সেখানে তার পৌরুষ অহংকারে উথলে ওঠে। নারীর প্রতি অবদমন আর পুরুষের ভিতরের ক্ষয়ে যাওয়া সত্তার এক বিকৃত প্রতিফলন ঘটে মতির এই আচরণে। সমাজের চোখে সে হয়তো প্রান্তিক, সে হয়তো নিরুপায়— কিন্তু এই নিরুপায় পুরুষই ঘরের মধ্যে একজন অসহায় নারীর জন্য হয়ে ওঠে আরো ভয়ংকর। গল্পের শেষ দৃশ্য যেন এক চূড়ান্ত পরিণতির ইঙ্গিত। বিকারের তীব্রতম পর্যায়ে মতি যখন উন্মাদপ্রায়, তাহেরা তখন অসহায় কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে—

> "কে আছো গো—পাগল হইয়া গেছে! পাগল!"[৭]

এই সমাজ কি তার মতো নিম্নবর্গের, ভাগ্যবিড়ম্বিত, হতভাগ্য মানুষদের জন্য কিছু করতে পারে? না, পারে না। কারণ তারা যে কেবল সংখ্যায় থেকে যায়, তাদের পরিচয় কখনো হয়ে ওঠে না। মতির বিকার তাই শুধু তার একার নয়, এ এক শ্রেণির মানুষের নৈমিত্তিক দুঃস্বপ্ন, যা সমাজের দেয়ালে অদৃশ্য অথচ গভীরভাবে আঁকা থাকে। তার শোচনীয় নিদারুণ বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাহেরার মতো অসহায় নারীর জীবন বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে।

নারীর অসহায়তার নির্মম চিত্র 'জঠরবন্দি' গল্পটি। দারিদ্র্যের কষাঘাতে পিষ্ট, সমাজের নিম্নবর্গের নারীদের ভাগ্যে কী-ই বা থাকে? বেঁচে থাকার এক অন্তহীন লড়াই, যেখানে নিরাপত্তা নেই, নেই সম্মান, নেই অধিকার। আঙ্গুরী সেই বাস্তবতার প্রতিচিত্র— ন'মাসের গর্ভবতী, অথচ তার পাশে কেউ নেই। চিররুগ্ন স্বামী তাকে ফেলে রেখে চলে গেছে, ফিরেও আসেনি। আসলেও তার জীবনে আদৌ কোনো পরিবর্তন আসত কি? কারণ সংসারের যাবতীয় দায়ভার এমনিতেই তার কাঁধে। স্বামীর ওষুধ, খাবার, নিজের শারীরিক যন্ত্রণা— সবকিছু পেরিয়ে ঠিকে ঝি-এর কাজ করে সে দিন গুজরান করে। তবু, স্বামী নামক ব্যক্তির উপস্থিতি যেন একটুকরো মনস্তাত্ত্বিক অবলম্বন। প্রতিবেশী স্বর্ণলতার দয়া-দাক্ষিণ্যে কোনোরকমে বেঁচে আছে সে। কিন্তু সমাজ কি একজন একাকী, স্বামী-পরিত্যক্ত নারীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়? দেয় না। বরং তার দুর্বলতাকে আরও ক্ষত-বিক্ষত করার জন্য প্রস্তুত থাকে চারপাশের লোলুপ চোখ, অপেক্ষায় থাকে সুযোগসন্ধানী শকুনেরা।

গল্পের অন্যতম বাস্তবতা হলো নারীর মাতৃত্ব— যেখানে সন্তান জন্মদান নারীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলেও এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তার থাকে না। সন্তান ধারণক্ষম কি না, শরীর সুস্থ আছে কি না, এমনকি কতজন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 107 - 114
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সন্তান হবে—এসবের নিয়ন্ত্রণ পুরুষের হাতে, পরিবারের হাতে। সন্তান জন্ম দেওয়া যেন একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যেখানে নারীর অনুভূতি, শারীরিক সক্ষমতা কোনো গুরুত্বই পায় না। আঙ্গুরীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। অপুষ্টিজনিত রোগে দুই সন্তানের মৃত্যু দেখেও তার জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। বরং এক অমানবিক দাম্পত্যে সে প্রতিনিয়ত কেবল অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। যেখানে ভালোবাসা নেই, আছে শুধু কঠিন বাস্তবতা—

> "এমনিতেই চাপা স্বভাবের আঙ্গুরী। অপুষ্টিজনিত রোগে দুই ছেলের মৃত্যুর পর আরেকটি সন্তান গর্ভে মোটামুটি দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের অনেক সময়ই দু'জন অনেক জঘন্য কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। আঙ্গুরী তাকে বলেছে কুত্তার ছাও, স্বামী বলেছে বেশ্যামাগি।"[৮]

এমন সম্পর্কেও নারী একরকমের নির্ভরতার ছায়া খোঁজে। যদিও এই ছায়া তাকে রক্ষা করতে পারে না, পরিবর্তন আনতে পারে না। প্রথাবদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতির বাইরে যাওয়ার সাহস নারী করতে পারে না। করলে তাকে একঘরে করে রাখার জন্যই প্রস্তুত থাকে সমাজ, পরিবার, প্রতিষ্ঠান। আঙ্গুরীর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বামী পরিত্যাগ করে চলে গেলেও কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না, কিন্তু তার দেহটিকে ভোগ করার জন্য ব্যাকুল লোকের অভাব নেই। এখানে কাকের প্রতীকে প্রতিভাত হয়েছে সেই সমাজ, যারা নারীর দুঃসময়ের সুযোগ নিতে সদা প্রস্তুত। গল্পকারের বর্ণনায়—

> "বেলা পড়লে কাক আসে তির তির লাফিয়ে। পেছনে আরো কাক। বাচ্চাদের হুল্লোড় শুনে সরে গিয়ে টিনের চালে, সজনে গাছে বসে। আঙ্গুরীর পেটে হাঁ হাঁ ক্ষুধা। নেতিয়ে পড়া স্তনের হুকে হাত রাখতেই চোখে পড়ে ছায়া। চোখের মধ্যে ধাঁধা লেগে যায়। ঘোর ছায়া ছিন্ন করে দাঁড়ায় প্রকাণ্ড এক কাক। কাকটির ঠোঁটে একটি কাঁঠালের টুকরো। আঙ্গুরীর অশরীরী শরীর, লম্বা লকলকে জিহ্বা, শুকনো শক্ত হাত দৌড়ে গিয়ে-হেইস এরকম প্রচন্ড একটি শব্দের প্রতিধ্বনি তোলে। সবগুলো কাক রাস্তা পেরিয়ে দূরে চলে যায়। কাঁঠাল মুখের বড় কাকটি হলুদাভ টুকরোটা দরজার ওপর ফেলে দিয়ে অপর পাশের টিনের ওপর গিয়ে বসে। ...কাঙাল হাত বাড়িয়ে আঙ্গুরী কাঁঠালের কচকচে টুকরোটি দাঁতের তলায় পিষে ফেলে। এরপর যখন সন্তানের কাঁঠালের তৃষ্ণা আরো প্রবল হয়, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শরীর মাটির মধ্যে মিশে পড়তে চায়, তখন ঘোরে পড়ে মানুষের মতো আঙ্গুরী কাতর হাত বাড়ায়— কাক ও কাক। কাকটি এসে গর্ভবতী আঙ্গুরীর পেটে তিড়িৎ তিড়িৎ লাফাতে থাকে।"[৯]

সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ে সমাজে সহায়-সম্বলহীন নারীরা শেষমেশ নিজেদের নারীত্বও হারিয়ে ফেলে। তারা কেবল জীবনের ক্রমাগত এক যুদ্ধে নিজেদের বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়। আঙ্গুরীর সংগ্রাম তাই কেবল তার একার নয়, এটি এক পুরো বঞ্চিত, নির্যাতিত, দারিদ্র্যপীড়িত নারীর চিত্র— যারা সমাজের চোখে শুধুই এক শরীর, এক কর্মক্ষম হাত, কিন্তু কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নয়।

নেশার কাছে দুই মাতাল বন্ধু জাহিদ ও প্রণবের নতজানু হওয়ার গল্প 'আত্মসমর্পণ'। একটি সমাজ, যেখানে পুরুষের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃত, কিন্তু নারীর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়ত সীমাবদ্ধতার বেড়াজালে বন্দি, সেখানে রিনুর বিদ্রোহ যেন এক প্রতিবাদী সুর তোলে। 'আত্মসমর্পণ' গল্পের এই নারী চরিত্র কেবল দাম্পত্য জীবনের গ্লানিজনিত ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়নি, বরং সে উপলব্ধি করেছে যে, নিজের অস্তিত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা না করলে সে চিরকাল এক অবহেলিত, পদদলিত সত্তা হয়ে থাকবে। স্বামীর প্রতি তার যে আবেগ ছিল, তা বারবার আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে— একবার নয়, অসংখ্যবার। প্রত্যেকটি সন্ধ্যায়, যখন নেশার কুয়াশায় জাহিদের চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তখনই রিনুর মনোজগতে আরেকটি নতুন প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। সংসার কি কেবল নারীকে অবদমন করার এক নিগূঢ় ব্যবস্থা? নাকি এটি সেই জায়গা, যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং সহমর্মিতা সমানভাবে বিকশিত হয়?

গল্পের সূচনাতেই আমরা দেখি, জাহিদ আর তার বন্ধু প্রণব নেশার কবলে পড়ে প্রতিনিয়ত নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। এই নেশা কেবল তাদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, বরং তাদের চারপাশের সম্পর্কগুলোতেও বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। জাহিদের স্ত্রী রিনু এই পরিস্থিতি আর সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি চলে যায়, তবে তার এই প্রস্থান কোনো অস্থায়ী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 107 - 114
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অভিমান নয়—এটি তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সূচনা। গল্পে দেখা যায়, জাহিদ যখন নেশার আচ্ছন্নতায় স্ত্রীকে তুচ্ছ করে, তখন সে সামান্যতম অনুশোচনা বোধ করে না। বরং আরও একবার গাঁজার টান দিয়ে বলে—

> "আর একটা টান। এই টানটা রিনুর নামে উৎসর্গ করে দেব।"[১০]

এই বাক্যে ফুটে ওঠে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সেই নির্মম বাস্তবতা, যেখানে স্ত্রী কেবল এক অনুষঙ্গ, তার কোনো নিজস্ব সত্তা নেই, তার দুঃখ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়ার কোনো মূল্য নেই। কিন্তু রিনু এসব অন্যায়ের শিকার হয়ে কেবল নীরবে অশ্রু বিসর্জন দেয়নি। সে নিজেই নিজের পথ খুঁজে নিয়েছে, পুরুষের শাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করেছে। জাহিদের চোখে যখন এই বিদ্রোহ নারীর চরিত্রের 'ভ্রষ্টতা', তখন পাঠকের দৃষ্টিতে এটি পরাধীনতার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিবাদ। নারী যে কেবল পুরুষের সংযমের জন্য নয়, বরং নিজের অস্তিত্বের দাবিতেও সমাজের বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, সেটিই রিনুর চরিত্রের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে এখানেই শেষ নয়। এই বিদ্রোহ যে পুরুষের পৌরুষে আঘাত হানে, সেটি আমরা দেখতে পাই জাহিদের প্রতিক্রিয়ায়। যখন সে জানতে পারে যে প্রণবের সঙ্গে রিনুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তখন তার ক্ষোভ, যন্ত্রণা, ও প্রতিশোধস্পৃহা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। গল্পকারের ভাষায়—

> "যে রিনু তার নরম হাত দিয়ে জাহিদের গাল স্পর্শ করে, জাহিদের সাথে একই খাটে শোয়, জাহিদের গলা জড়িয়ে ভালোবাসার কথা বলে, বিয়ের এক বছর না যেতেই সেই রিনু ঠিক একইভাবে সমর্পিত হচ্ছে প্রণবের কাছে? যে প্রণবকে সে নিজের আত্মা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি, সে জাহিদের কথা একবারও না ভেবে রিনুকে স্পর্শ করেছে? কেন আজ প্রণব স্বীকার করল? নেশার ছুতোয় বিষয়টা সে কাটিয়ে যেতে পারত। তবে কি দু'জন সমঝোতায় এসে গেছে? পরিকল্পনা করেই রিনু বাপের বাড়ি গেছে? ...ভাবতে পারে না জাহিদ। ওর ইচ্ছে হয় থাপ্পড়ে লাল করে দেয় রিনুর গাল। রেললাইন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিশপিশ করা হাতকে অনেক কষ্টে সামলায়। ...অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলে ওঠে জাহিদের ভেতরটা। রিনু যদি কিশোরগঞ্জ চলে না যেত তাহলে এক হাত দেখে নিত জাহিদ।"[১১]

অথচ এই প্রতিক্রিয়ার পেছনে লুকিয়ে থাকে এক গভীর বৈপরীত্য— একদিকে সে নিজেই রিনুকে অবহেলা করেছে, ভালোবাসা ও সম্মান দিতে ব্যর্থ হয়েছে, বারবার রিনুর আপত্তি সত্ত্বেও সে পুনরায় নেশার কাছে নতজানু হয়েছে। প্রতিবারই তার কাছে স্বাস্থ্যকর দাম্পত্য সম্পর্কের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে অস্বাস্থ্যকর নেশা। হাজার কান্নাকাটি ঝগড়া ঝাটি করেও রিনু জাহিদকে সুস্থ জীবনে ফেরাতে পারেনি। তাই অবজ্ঞা-অবহেলা-অপমানে বিপর্যস্ত রিনু যখন নিজের ইচ্ছায় মুক্তির নতুন পথ বেছে নিয়েছে, তখন জাহিদ তা সহ্য করতে পারছে না। এখানে পুরুষতন্ত্রের দ্বৈত চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে— নারী যখন পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তখন সে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু যখন সে নিজের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে 'অবাধ্য', 'অবিনীত', 'ভ্রষ্টা'। তবে গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, রিনুর আত্মসমর্পণ আসলে কার কাছে? সমাজের বিধিনিষেধের কাছে? না, সে আত্মসমর্পণ করেছে নিজের সত্তার কাছে। সে বুঝতে পেরেছে, যদি সে নিজের জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, তবে সারাজীবন কেবল অন্যের ইচ্ছার পুতুল হয়েই থাকতে হবে। তাই সে সমস্ত শেকল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। এ সমাজ হয়তো তাকে অপরাধী হিসেবে দেখবে, নিন্দার চোখে বিচার করবে, কিন্তু সে সেসব নিয়ে চিন্তিত নয়। তার লক্ষ্য একটাই— নিজের জন্য নিজের জীবনের অধিকার নিশ্চিত করা।

এভাবেই 'আত্মসমর্পণ' গল্পের মধ্যে এক নতুন বয়ান নির্মিত হয়, যেখানে নারী কেবল সহনশীল, আত্মত্যাগী কিংবা পুরুষের অনুগামী নয়, বরং এক স্বাধীনচেতা, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সত্তা, যে তার নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করতে চায়। সমাজের চোখে এটি হয়তো একটি 'বিপর্যয়', কিন্তু নারী জাগরণের ইতিহাসে এটি এক সাহসী পদক্ষেপ, যে পদক্ষেপে প্রতিধ্বনিত হয় স্বাধীনতার সত্য স্বরূপ।

সব মিলিয়ে বলা যায় নাসরীন জাহানের গল্প সময়ের প্রতারণাময়, জটিল ও বহুমুখী সংঘাতে বিপর্যস্ত ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের এক অন্তর্দৃষ্টি। সচেতন শিল্পী হিসেবে তিনি গল্পে সহজ বর্ণনা, সোজাসাপটা কাহিনি কিংবা ঘটনাবহুল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 107 - 114
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্লটকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে সময়ের বাস্তবতাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন প্রতীকের গভীরতা ও রূপকের রহস্যময়তায়। তাঁর গল্পের নারী-চরিত্রগুলোও তাই নাম-পরিচয়হীন, অস্পষ্ট, কখনো রহস্যময়, কখনো বা অসম্পূর্ণতার ঘেরাটোপে বন্দি— এ যেন সময়ের প্রতিচ্ছবি, যা শনাক্তহীন, অথচ সর্বব্যাপী। তিনি তুলে ধরেছেন মানুষের ভেতরকার ক্ষয়, মানসিক বিপর্যয়, নারীজীবনের বিচিত্র দোলাচল, পুরুষ ও নারীর অভিন্ন সমাজে দুই বিপরীত বাস্তবতা, এবং সামাজিক সংকটের নির্মম প্রতিচিত্র। প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এক অস্থির, অসহিষ্ণু সমাজব্যবস্থার চিত্র— যেখানে সম্পর্কের টানাপোড়েন, সামাজিক জটিলতা, ও ক্রমবর্ধমান সংকট মানবজীবনকে এক অবিন্যস্ত পথে ঠেলে দিচ্ছে। তাঁর গল্পের চরিত্ররা কেবল ব্যক্তি নয়, তারা সময়ের প্রতিনিধি— সমাজের ভাঙাচোরা চেহারারই প্রতিফলন। 'স্থবির যৌবন' সংকলনের গল্পগুলো লেখিকার কৈশোর ও তারুণ্যের ভাবনার প্রতিচিত্র। বয়সে নবীন হলেও তাঁর গল্পগুলোর বিস্তৃত পরিসর ও বর্ণনার ধরণেই বোঝা যায় এক সম্ভাবনাময় শিল্পবোধের জন্ম। রহস্য ও কল্পনার আবরণে তিনি যে বাস্তবতাকে উপস্থাপন করেছেন, তাতে সময় ও সমাজের বহুমাত্রিক রূপ যেমন স্পষ্ট, তেমনি নারীর জীবনসংগ্রাম ও মনোজগতের জটিলতাও গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নাসরীন জাহানের লেখনীতে তাই সময় ও সমাজ কেবল পটভূমি নয়, বরং চরিত্র হয়ে ওঠে, যা তাঁর গল্পের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতাকে পরিচালিত করে।

Reference:

১. জাহান, নাসরীন, 'পরগাছা', 'স্থবির যৌবন', গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ২৪
২. জাহান, নাসরীন, 'জনক', 'স্থবির যৌবন', গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৩৬
৩. জাহান, নাসরীন, 'জনক', 'স্থবির যৌবন', গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৪০-৪১
৪. জাহান, নাসরীন, 'জনক', 'স্থবির যৌবন', গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৪৪-৪৫
৫. জাহান, নাসরীন, 'বিকার', 'স্থবির যৌবন', গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৫৪
৬. জাহান, নাসরীন, 'বিকার', 'স্থবির যৌবন', গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৫১
৭. জাহান, নাসরীন, 'বিকার', 'স্থবির যৌবন', গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৫৫
৮. জাহান, নাসরীন, জঠরবন্দি, 'স্থবির যৌবন', গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৫৭-৫৮
৯. জাহান, নাসরীন, জঠরবন্দি, 'স্থবির যৌবন', গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৬০
১০. জাহান, নাসরীন, আত্মসমর্পণ, 'স্থবির যৌবন', গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৬২
১১. জাহান, নাসরীন, আত্মসমর্পণ, 'স্থবির যৌবন', গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৬৭